বাঙ্গলায় বিপ্লববাদ

বাঙালির বিপ্লববাদ

নলিনী কিশোর গুহ

শতবর্ষের সংস্করণের
সম্পাদনা, ভূমিকা ও টীকা

খান মাহবুব

KOBI PROKASHANI

বাঙ্গলায় বিপ্লববাদ
নলিনী কিশোর গুহ

শতবর্ষের সংস্করণের সম্পাদনা, ভূমিকা ও টীকা
খান মাহবুব

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ২৭৫ টাকা

Banglai Biplabbad by Nalini Kishore Guho edited by Khan Mahbub Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: February 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 275 Taka RS: 275 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-29364-0-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সূচিপত্র

শতবর্ষ সংস্করণের ভূমিকা ৭
প্রথম সংস্করণের নিবেদন ১৫
উপক্রমণিকা ১৭
বাঙ্গলায় মাল মশলা ছিল ২০
সূচনা ২৩
দেশাত্মবোধ ২৬
স্বদেশী আন্দোলনের আর একটা দিক ২৯
মনোভাবের লোকসমাগম ৩১
বিপ্লবের এক অঙ্ক শেষ হইল ৩৪
গুপ্ত-ধারা ৩৬
সমিতির দুর্দিন ৩৮
মামলা ৪০
জেলের এক অধ্যায় ৪৫
জেলের দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৯
মামলার ফল হইল না ৫২
মতভেদ ৫৫
সমাজ ও সাহিত্যে বিশেষত্ব ৬০
দলগড়া ৬৫
ঘরছাড়া-গোপন ও অখ্যাত জীবন ৬৯
ডাকাতির কথা ৭২
ডাকাতির আরেক অধ্যায় ৭৬
খুন ৮১
ফেরারী ৮৭
আগুনের খেলা ৯৮
বৈদেশিক অংশ ১০৩
বিপ্লবের শেষ শিখা ১০৯
বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা ১১৪
পরিশিষ্ট-১ ১১৯
পরিশিষ্ট-২ ১২০
পরিশিষ্ট-৩ ১২৪

শতবর্ষ সংস্করণের ভূমিকা

পৃথিবীর সামাজিক ভূগোলের পরিবর্তনে বিপ্লবের প্রভাব সর্বময়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে আজকের পৃথিবীর অবস্থানে বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ বড় নিয়ামক। অধিকার হরণ ও এর বিপরীতে অধিকার রক্ষার নিমিত্তেই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসকের লাগাতার নির্যাতন, অধিকার হরণ, লুণ্ঠন ইত্যাদি নীতি বিবর্জিত আচরণ সমাজ-যন্ত্রে ক্রিয়াশীল হওয়ায় প্রান্তিকের মানুষের মাঝে বিপ্লবের বীজ রোপিত হয়েছে। বিপ্লবের ফল আপাত দৃষ্টিতে স্বল্প মেয়াদে পরিপূর্ণ ফলাফল না আনলেও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলেছে। বিপ্লবের রেশ মানুষের মনোভুবনে রয়ে রায় এবং বহমান থাকে বংশপরম্পরায়। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষ প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ভারতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিপ্লবের অগ্নি উঁকি দিলেও তা দাউ দাউ করে জ্বলতে পারেনি। মূলত ইংরেজ উপনিবেশ বিশেষত সিপাহি বিপ্লবের পর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ জাগরণ হলে স্বশাসনের বাসনা সামনে রেখে বিপ্লব জেঁকে বসে।

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হতে ভারতের শাসন ব্রিটিশ রাজের হাতে চলে গেলেও ভারতবাসীকে ধোঁকা দিতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় কতিপয় আনুষ্ঠানিক আবরণের মধ্যে কোম্পানি নিজেকে লুকিয়ে রেখে অদৃশ্যভাবে শাসন করত। আনুষ্ঠানিক আবরণ হচ্ছে বাদশাহ ও নবাবের সঙ্গে অতীতের চুক্তিসমূহ ও শাসনক্ষেত্রে কোম্পানির হস্তক্ষেপ না করার নীতি। টাকায় খচিত হয় মোগল বাদশাহ্‌র নাম। আইন-কানুন প্রণীত হয় মোগল সরকারের নামে, দণ্ডবিধানের সর্বোচ্চ ব্যক্তি নবাব নিজে। অতএব, মনে হয় দেশের সার্বভৌমত্ব মোগলদের হাতেই, খটকাটা এখানেই। পরিস্থিতি সাপেক্ষে সার্বভৌমত্ব নবাব ও কোম্পানির উভয়ের মধ্যেই বর্তমান। দেশে অবস্থিত অন্যান্য বিদেশি জাতির সঙ্গে সম্পর্কের বেলায় নবাবই সার্বভৌম সত্তা, কিন্তু কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কে নবাব কোম্পানির হাতে পেনশনপ্রাপ্ত পুতুলমাত্র। [সূত্র : অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ও ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, ঢাকা, নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০২৩, পৃ. ২১৮]

ব্রিটিশদের দ্বিচারিতা ও ছলচাতুরির মাঝেই ভারতীয়দের ক্ষোভ পরতে পরতে পুঞ্জীভূত হয়। বিপ্লব যে শুধু প্রান্তিকের মানুষের মাঝে হয়েছে তা নয়, স্থানীয় জমিদারদের মাঝেও হয়েছে। মোগলদের ন্যায় ইংরেজ সরকার জমিদারদের দেশ

শাসনে অংশীদার না করে শোষণক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করে। পূর্বতন সমস্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয় এবং তাদের বাধ্য করা হয় বর্ধিতহারে রাজস্ব দিতে। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেও জমিদাররা অনেক সময় প্রজাপীড়ক হয়েছে। জমিদাররা অনেক সময় ব্রিটিশদের বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবও করেছে।

সশস্ত্র প্রতিরোধকারী জমিদারদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের ডালভূম রাজাদের ১৭৬৫ সালের বিদ্রোহ। ১৭৮৭ সালে পূর্ববঙ্গের হাতিয়া ও সন্দ্বীপের জমিদারগণ সম্মিলিতভাবে সরকারের অত্যাচারমূলক 'শাসক নীতি' প্রতিরোধ করে এবং লবণ কারখানায় নিয়োজিত কোম্পানির কর্মচারীদের এলাকা থেকে বহিষ্কার করে। এ রকম কিছু নজির থাকলেও ভারতীয় গণমানুষের অগ্নিযুগের বিপ্লবপর্বে বিপ্লবীরা ইংরেজ ও দেশীয় ইংরেজ মোসাহেব জমিদারদের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে। বিপ্লবের পূর্বে কখনো গুপ্ত, কখনো সুপ্ত, কখনো বা প্রকাশ্যে বিপ্লবীদল ক্রিয়াশীল হয়েছে। বিপ্লববাদে কেবল শাসকদের কোনো বিশেষ ঘটনা বা পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় প্রতিবাদ-প্রতিরোধে বিপ্লব স্থির থাকেনি বরং দূরবর্তী লক্ষ্যে অর্থাৎ ভারতবাসীর স্বাধীনতার লক্ষ্যে বিপ্লবীদের কাজের গাথা সংযুক্ত হয়েছে।

বাংলায় ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লববাদের কারণ ও অনুষঙ্গ বুঝতে হলে ব্রিটিশ শাসনের পরিবর্তনগুলোকে আমলে নিতে হবে। মুর্শিদাবাদের শাসকচক্র উৎখাত করে ব্রিটিশরা প্রতিষ্ঠিত করে আধিপত্যের উপদ্রব। নবাব হারায় ক্ষমতা, অভিজাত শাসকশ্রেণি হারায় এর শাসনক্ষমতা ও অর্থনৈতিক শক্তি। রায়তশ্রেণি কর ও নানা তোষণে শুষ্ক ও শীর্ণ। ব্যবসায়ী ব্যবসা হারায়। তাঁতি, মালঙ্গী বাস্তুচ্যুত হয়ে দাসে পরিণত হয়। এমনকি সংসার ত্যাগী ফকির সন্ন্যাসীরা শঙ্কিত। নবাবের সিংহাসন থেকে গরিবের পর্ণকুঠির পর্যন্ত এমন উলট-পালট পূর্বে ঘটেনি। ফলে বিপ্লব অনিবার্য হয়েছিল।

সমাজের শ্রমজীবী শ্রেণির মধ্যে ব্রিটিশ আমলে সর্বোচ্চ সংখ্যাগুরু ছিল কৃষকশ্রেণি। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় সবচেয়ে সংখ্যাগুরু শ্রেণি ছিল কৃষক। সংগত কারণেই সমাজের তাপ-উত্তাপের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতো কৃষকদের মাধ্যমে। ব্রিটিশ সরকার কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্মসাতের জন্য ব্যস্ত থাকলেও খরা, প্লাবন, দুর্ভিক্ষসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সে সরকার ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। এ কারণেই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয় ঘন ঘন। বিভিন্ন শ্রেণির বিদ্রোহের যোগসূত্র ঘটে সমাজের পুরো যন্ত্রে। ফলে বিপ্লবী কর্মে তৎপর হয় সমাজের প্রাগ্রসর ও অধিকার সচেতন অংশ। সমাজের ভেতর ক্রিয়াশীল হয় বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ ও পেশার মানুষের বিপ্লব। বাংলার বিপ্লববাদীদের শাসকশ্রেণি কেবল Anarchist অরাজকপন্থী বলেই ক্ষান্ত হননি, বলেছেন এরা স্বাধীনতাপ্রয়াসী বিপ্লববাদী। ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম নীতি ছিল ব্রিটিশদের শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে

এমন বিষয়, ঘটনা, ব্যক্তিকে নির্মূল করা। ফলে বিপ্লববাদ সমাজের বিভিন্ন কোণ থেকে অসংগঠিতভাবে কাজ করলেও অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর সমিতিসহ বেশকিছু সংগঠন কাজ করলেও ভারতের মূলধারার রাজনীতিতে এরা সর্বভারতীয় বড় প্রভাব বলয়ের বাইরে ছিল। এক্ষেত্রে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, ফরোয়াড ব্লক, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি কখনো কখনো বিপ্লবী কাজে সহযোগী হয়েছে। বিশেষত কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারত ছাড় আন্দোলনের পর মূলধারার আন্দোলনে জ্বালানি সরবরাহ করেছে বিপ্লববাদীরা। কংগ্রেসের মাধ্যমে ভারত ছাড় আন্দোলন প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেন—প্রথম চোটে এটাই তারা ধরে নিল ব্রিটিশকে ভারত থেকে বিতাড়ন করার জন্য এতদিনে কংগ্রেস একটি গণ-আন্দোলন শুরু করতে চলছে। প্রকৃতপক্ষে কিছুদিনের মধ্যেই প্রস্তাবটি যেমন লোকের কাছে তেমনি সরকারের কাছেও ভারত ছাড় প্রস্তাব হিসেবে বর্ণিত হতে লাগল। [সূত্র : মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, *ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম*, ঢাকা, শোভাপ্রকাশ, ২০২৩, পৃ. ৯২]

ইংরেজরা ভিনদেশি, তারা কেন ভারতবর্ষ শাসন করবে—এমন মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন ভারতীয় মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেললেও এর চেয়ে প্রগাঢ় কারণ ছিল বিপ্লববাদের ইংরেজের ভেদনীতি। বিপ্লববাদে দীক্ষিত বিপ্লবীরা নানা গ্রুপ, দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করত। এ কাজের সমন্বিত রূপ খুব বেশি সংগঠিত ছিল না। তবে ইংরেজদের শাসনব্যবস্থা চ্যালেঞ্জ ও ভেঙে দেওয়ার নানান প্রকরণ ছিল। বিপ্লবীরা একে দেশরক্ষা ও দেশের মুক্তির স্বপক্ষের বিষয় মনে করত। এ জন্য একে স্বদেশি আন্দোলন মোটাদাগে বলা যেতে পারে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টভাবে জনসমাজে দেখা গেল। বিপ্লবীরা বুঝে গেল ইংরেজদের কাছে আবেদন-নিবেদনে স্বাধীনতা মিলবে না। শক্তি সঞ্চয় ও অকাতরে প্রাণ বলিদানে বাংলায় তথা ভারতবর্ষে বিপ্লব জোরদার হলো। অতঃপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ইংরেজের শত্রু জার্মানির কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনে সারা ভারতব্যাপী একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের চেষ্টায় তাঁদের প্রতিনিধিরা জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। বিপ্লবীদলের ব্যাপকতা দেখে ইংরেজ সরকার ভবিষ্যতে শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখতে চিন্তিত হয়ে পড়ে। বিপ্লবীদের পিষে মারার জন্য রাউলাট অ্যাক্ট পাস করে নির্বিচারে সন্দেহবশে গ্রেপ্তার ও অনির্দিষ্টকালের জন্য কারারুদ্ধ করে রাখার জন্য মোক্ষম আইন প্রণয়ন করে নেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় নির্যাতনের মাত্রা অযাচিতভাবে বেশি হলে নির্যাতিতরা সংগঠিত হয়। ইতিহাসের এই অমিয় বাণীর সাক্ষ্য মিলে বাংলার বিপ্লববাদে। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত 'বঙ্গে বিপ্লব আন্দোলন—গোড়ার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধটির লেখক শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল বলেছেন—"কথিত আছে, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথের শিষ্য বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ডা. যাদু গোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : যতীন্দ্রনাথের মুখে শোনা যে তিনি ক্রমশ দেশপ্রেম ও দেশের

প্রতি কর্তব্যের কথা আলোচনা করতে করতে শ্রী অরবিন্দুকে রাজনীতিতে টানেন ও বাঙ্গলায় আনেন।" বাগল মহাশয় পরেই বলেছেন এ বিষয়ে আমরা কোনো বিতর্কের মধ্যে না গিয়াও বলিতে পারি যে যতীন্দ্রনাথ ও শ্রী অরবিন্দ উভয়েই ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য ঐকান্তিক প্রয়াসী হইয়াছিলেন। উভয়েই কোনোরূপ বিপদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সংকল্প অনুযায়ী কার্য করিতে অগ্রসর হন। বিপ্লবীরা নিজেদের মানব ঢাল হিসেবে মেনে নিয়ে ইংরেজ ও তাদের দোসরদের প্রাণ হননের কাজে লিপ্ত হয়। পূর্ববঙ্গ বিপ্লবী কর্মের জন্য গুরুত্বের দাবিদার। ১৯৩০ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকা মেডিকেলের কাছে পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যান ও পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট হডসনকে গুলি করেন বিপ্লবী বিনয় বসু। লোম্যান তৎক্ষণাৎ নিহত হন, হডসন গুরুতর আহত হন। ৮ ডিসেম্বর বিনয় বসু দুজন বিপ্লবীকে নিয়ে কলকাতার রাইটার্স-এ কারাগারের ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসনকে গুলির আঘাতে শেষ করে দেন এবং শ্বেতাঙ্গদের ওপর গুলি চলে যতক্ষণ তাঁদের কাছে গুলি ছিল। গুলি নিঃশেষ হয়ে গেলে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে সুধীর গুপ্ত (বাদল) নিজেকে সেখানেই লোপ করে দেন। পাঁচ দিন পর আহত বিনয় বসু হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিচারে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়। [সৌম্য বসু সম্পাদিত, *ফিরে দেখা বাংলার বিপ্লববাদ*, কলকাতা, খড়ি প্রকাশনী, ২০২২, পৃ. ১১৬]

বিপ্লববাদীর কারণে ব্রিটিশদের প্রাণহনন ও ভারতীয়দের আত্ম বলিদানের নজির বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বাড়তে থাকে। ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ ভগৎ সিং, শুকদেব এবং রাজগুরুসহ তিনজনের ফাঁসি হয়। একই সালে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি সাহেবকে নিহত করেন বিমল দাশগুপ্ত। এক মেদিনীপুরেই পেডি সাহেব ছাড়া ভগলাস, বার্জ অর্থাৎ পরপর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নিহত করা হয়। হত্যাকাণ্ডে ফাঁসি, দ্বীপান্তর ও দীর্ঘমেয়াদি কারাবাস হয় বিপ্লবীদের। ১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই তারিখে বিচারক গার্লিক সাহেবকে এজলাসে গুলি করে হত্যা করেন কানাই ভট্টাচার্য। ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর কুমিল্লার অত্যাচারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেংসকে হত্যা করেন শান্তি ও সুনীতি। বিচারে তাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি সূর্যসেনের মহাপ্রয়াণে বিপ্লব বাংলায় যেন নব জ্বালানি পেল। সূর্যসেন ও তার কর্মী তারকেশ্বর দস্তিদার বিপ্লবযাত্রায় নব মাত্রা দিল। বিপ্লবীরা নিজেদের কর্মকৌশলে স্বাধীনতার জন্য কাজ করার সাথে রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহের সঙ্গে কিংবা সমতলেও চলছেন অনেক সময়। ১৯১৯ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে বে-আইনি রাউলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে সারা ভারতব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জেগে ওঠে। কংগ্রেস ১৯২১ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। বিপ্লবীরাও গণজাগরণের সুষ্ঠু পন্থা হিসেবে এই আন্দোলনে আন্তরিকতার সাথে যোগ দেন। বিপ্লবীরা গান্ধীজিকে কথা দিলেন বিপ্লবী আন্দোলনকে একবছর স্থগিত রাখবেন এবং সর্বান্তঃকরণে কংগ্রেস পরিচালিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য কাজ করে যাবেন।

পরবর্তীতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন কখনো থেমে গেছে, কখনো বা স্থবিরতা দেখা গেছে কিন্তু বিপ্লবীরা সুযোগ পেলেই গুপ্ত হামলা, গেরিলা আক্রমণসহ সশস্ত্র কায়দায় আন্দোলন চালিয়ে গেছে।

একটা বিষয় স্মরণে রাখা প্রয়োজন, ব্রিটিশ ভারতের ভারতীয় রাজনৈতিক দলের অঙ্কুর লগ্নের প্রবণতা ছিল নতশিরে আবেদন ও নিবেদনের থালা বহন করিয়া পূজা দ্বারা ইংরেজ রাজের তুষ্টি বিধান করা। উন্নত শিরে নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতিরোধ করার কল্পনা ব্যক্তিবিশেষের মনে উদিত হলেও কার্যে পরিণত করার নজির কম। এজন্য রাজনৈতিক শক্তির ওপর ভরসা না করে কিংবা এই জাতীয় নরমপন্থী দলের ওপর আস্থা না রেখে মুক্তিকামী বিপ্লবীরা চরমপন্থী বিপ্লববাদী দীক্ষা নিয়ে ক্রিয়াকর্ম চালায়। বিপ্লববাদীরা জনসমাজে আদৃত ছিল। ফলে সমাজের ভেতর আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বিপ্লববাদ এগিয়ে চলে। ইংরেজ শাসনের মোহ ও মায়াকে ত্যাগ করে স্বরাজ লাভের মনোভুবনের বাসনায় ভারতবাসীর স্বপ্নে একটু আলোর উঁকি ছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক বিপ্লবাত্মক রূপ প্রকটিত হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মের দার্শনিক ফল বিপ্লববাদকে কিছুটা অনুসমর্থন দিয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিবাদ, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, বয়কট ও বিপ্লবীদের কর্ম ব্রিটিশদের কাছে সামষ্টিক প্রতিরোধ হিসেবে গণ্য হয়। ব্রিটিশদের নানামুখী বয়কট ও প্রতিরোধকর্মের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন যুগপদ হয়। বিপ্লবীরা ভিন্নপথে শুধু বয়কট নয় ব্রিটিশদের বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন জোরদার করে। ২১ জুলাই শুক্রবার দিনাজপুরের প্রধান বক্তা ব্যারিস্টার লাল মোহন ঘোষ জনসাধাণের কাছে সামগ্রিক 'বয়কট' যুদ্ধের সংকল্প গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। [*সঞ্জবনী* পত্রিকা, ২৭ জুলাই ১৯০৫]

পাবনা, জলপাইগুড়ি, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, মাগুরা, বগুড়া, যশোহর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, বরিশাল, প্রভৃতিস্থানে অনুরূপ প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববঙ্গের জমিদারদের এক সভায় মুক্তাগাছার জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর বাড়িতে ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে সর্বজনীনভাবে 'বয়কট' প্রস্তাব গ্রহণ, প্রচার ও প্রয়োগের সপক্ষে সিদ্ধান্ত হয়। এসব বিষয়ের তাপ-উত্তাপ বিপ্লবীদের কাজের গতি-প্রকৃতিতে প্রভাবক হয়েছে।

বিপ্লবীদের কাজে সবচেয়ে সহযোগী ছিল ১৯০৬ সালে কলকাতা থেকে বারীন্দ্র ঘোষ, অভিনাশ ভট্টাচার্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত *যুগান্তর* পত্রিকা। এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সাপ্তাহিক। বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির প্রচারণার অঙ্গ হিসেবে কাজ করত। পত্রিকাটি স্বাধীনতার রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সহিংসতাকে ব্যাখ্যা এবং ন্যায্যতা প্রদান করে এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অধিকার এবং বৈধতার নিন্দা করে। *যুগান্তর* পত্রিকা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং এর মধ্যপন্থী পদ্ধতিরও সমালোচনা

করেছিলেন। এর লক্ষ ছিল বাংলার তরুণ, শিক্ষিত এবং রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত তরুণরা। [সূত্র : উইকিপিডিয়া]

মূলত বিপ্লববাদে দীক্ষিত করতে এই পত্রিকা চেতনাগত ও দার্শনিক প্রভাব ফেলত। ইংরেজ শাসনে আর্থিক ভারতের রূপান্তরও জাতীয়তাবাদের স্ফুরণে ছিল এক বিশেষ কার্যকর শক্তি। এই শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটেছে বহুধা বিভক্ত হয়ে। বিপ্লববাদ এর মাঝে অন্যতম নিয়ামক। বিপ্লববাদে সমাজের ভেতর রজুতে নানা রশদ কাজে লেগেছে। বিপ্লবীদের একটা বড় ইতিবাচক দিক ছিল ধর্মীয় জাতপাতের ধার ধারতেন না। এজন্য তাদের মুখপাত্র পত্রিকা *যুগান্তর*-এ প্রচ্ছদপটে ত্রিশূল, তলোয়ার ও চন্দ্রের সমন্বিত ছবিটি একাধারে শক্তি অসাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন। বস্তুত হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায়ের লোকই বিপ্লবীদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলমান সভ্যদের মধ্যে মজীবুর রহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [সূত্র : হরিদাস মুখোপাধ্যায়, উমা মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, কলকাতা, দে'জ, ২০১৭, পৃ. ১২২]

অগ্নিযুগে এখনকার মতো যোগাযোগব্যবস্থা ও তথ্যপ্রবাহ উন্নত না হলেও বিপ্লবীরা নিজস্ব চ্যানেলে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। পূর্ববঙ্গের ঢাকায় যেমন 'অনুশীলন' কর্মীদের কেন্দ্র ছিল। আর চন্দননগর ছিল চরমপন্থী বিপ্লবীদের আখড়া। মাটির তলায় গুপ্ত কুঠুরিতে বোমা তৈরি, দেশের তাবড় তাবড় ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের হত্যার পরিকল্পনা চন্দননগরের বিপ্লবী কার্যক্রম—এই শহরকে বিপ্লব দুর্গে পরিণত করে। গঙ্গাতীরের চন্দননগরের বিস্ফোরক প্রস্তুতি, গুপ্তহত্যা ব্রিটেনের ত্রাস হয়ে উঠেছিল। অগ্নিযুগে দীর্ঘ এক শতকে চন্দননগরে কোনো অস্ত্র আইন ছিল না। ফলে বোমার উপকরণ বিভিন্ন স্থান থেকে জোগাড় করে স্বচ্ছন্দে বোমা তৈরি হতো চন্দননগরে। এরপর তা ছড়িয়ে পড়ত ভারতের নানা প্রান্তে। চন্দননগরে গুপ্ত সমিতির যোগাযোগ নেটওয়ার্ক এতটাই শক্ত ছিল যে ব্রিটিশ পুলিশের গুপ্তচর চন্দননগরে প্রবেশ করতে অনুমতি প্রার্থনা করাতেই খবর নিমেষে পৌঁছে যেত গুপ্তসমিতির নৈশ বিদ্যালয়ে। [সূত্র : সৈকত নিয়োগী, *অগ্নিযুগের চন্দননগর*, কলকাতা, পত্রলেখা, ২০২৪ পৃ. ৩]

বিপ্লবীদের সাথে প্রথাগত রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ থাকলেও বিপ্লবীরা চরমপন্থী বলে আদর্শিক দ্বন্দ্ব ছিল রাজনৈতিক দলের আদর্শ ও কর্মের সাথে। তবে বিপ্লবীদের কাজে খুশি হলেও প্রকাশ্যে বলতে পারতেন না নিয়মতান্ত্রিকতার জন্য। এজন্য নেতাজি সুভাষের চরমপন্থা, কবি নজরুলের স্বাধীনতার জন্য রণহুংকারে রাজনীতিবিদদেরে স্বপ্রতিভ সম্মতি কম লক্ষণীয়। তবে তাদের মনোজমিনে কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন বিপ্লবী ক্রিয়া জোরদার হলে স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হবে।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লববাদ কতটুকু প্রভাবক ছিল তা হয়তো ওজনের নিক্তিতে পরিমেয় নয়। কিন্তু অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা সব সময় ইংরেজদের জুলুম ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কর্মের মাধ্যমে বার্তা দিয়েছে। ফলে ইংরেজরা বুঝতে

পেরেছে ভারতীয় ভূমিজরা ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না। ভারতের স্বাধীনতার সূর্য উঁকি দিয়েছে রাজনৈতিক আন্দোলন, গণমানুষের অভিলাষ, বিপ্লবী কর্ম সর্বোপরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্ব প্রেক্ষাপটের কারণে।

শতবর্ষ পূর্বে নলিনী কিশোর গুহ রচিত *বাঙ্গলায় বিপ্লববাদ* গ্রন্থে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কর্মের বিবরণ শুধু নয়, তৎসময়ের ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে উপক্রমণিকা লিখতে গিয়ে বলেছেন—

> এসেছে সে একদিন,
> লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ,
> জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।

বিপ্লবীদের কথা জনসমাজে জানাবার দায়বদ্ধতা নিয়ে লেখক লিখেছেন—

> যাহারা জেলে নির্বাসনে যাইতে বা তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে দেশবাসীর বাহবা পায় নাই, হয়তো খুব বেশি, খবরের কাগজে শুষ্ক খবর মাত্রই বাহির হইয়াছে—ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিলেও যাহাদের জন্য এক ফোঁটা জল ফেলিবার সামর্থ্যও দেশবাসীর হয় নাই,—বুদ্ধিমান অভিজ্ঞদের কথায়, যাহারা কেবল ভুলই করিয়াছে, সেই ভ্রান্তিপথের মৃত্যুযাত্রী এমন অদ্ভুত মানুষগুলির কথা কেমন করিয়া বলিব।

বিপ্লবীদের নিয়ে জনমানুষে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছিল। নিরীহ মানুষের অনেকেই মনে করত বিপ্লবীদের কাজের ফলে শাসকরা আরও বেশি নির্যাতন চালায়। ফলে বিপ্লবীরা তৎপর না থাকলেই মঙ্গল। ইংরেজ তাবেদার শ্রেণির মানুষ তো রীতিমতো বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাত কিন্তু ছাই চাপা আগুন যে জ্বলে স্ব-শক্তিতে সে কথা তো সত্য। তাই বিপ্লববাদ চলেছে।

সমাজসংস্কারক হিসেবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সকলেই জাতির কাছে নানাভাবে মুক্তির প্রচার দিয়েছেন। সেই প্রচারের দার্শনিক শক্তি থাকলেও নেতাজি সুভাষ বসু কিংবা কাজী নজরুলের লেখায় যে তরল অনল ছিল তেমনটা খুব একটা নজর কাড়ে না। তবে বিপ্লবীরা অনুকরণ, অনুসরণের চাইতে অন্তঃগরজ থেকেও বিপ্লবী কাজে যুক্ত হয়েছে। গ্রন্থের লেখকের ভাষায়—

> বাঙ্গলার যুবজন দেশাত্মবোধের নতুন ধারায় উত্তরাধিকার সূত্রে সেই মনের মালিক হইয়া একেবারে এক অপূর্ব পথে যাত্রা করিয়া বসিল।

বাঙ্গলায় বিপ্লববাদ গ্রন্থে ঘটনাপ্রবাহ চমৎকার রূপে বর্ণিত হয়েছে। গ্রামগঞ্জের মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বিপ্লবীদের কথা শুনেছে। লেখক নলিনী কিশোর গুহের বর্ণনায়—

> বৃষ্টিতে ভিজিয়াই সকলে সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দের কথা শুনিবে। দৈব যদি কেউ ছাতা মেলিয়া ফেলিত তাহাও ঐ ত্যাগের রাজ্যে তৎক্ষণাৎ বন্ধ। গ্রামে গ্রামে সভা। ৫ মাইল ১০ মাইল দূরে সভা। রৌদ্র মাথায় করিয়া খাঁ খাঁ করা মাঠের মধ্য দিয়া দল বাঁধিয়া সভায় চলিলাম। মুখে আবার ঐ সময়ের গানের সুর খেলিতেছে—নগরে নগরে জ্বালরে আগুন, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ।

এই গ্রন্থে অনেক বিপ্লবীর বহুরৈখিক কাজের তালিকা আছে। সেই তালিকা এখানে সন্নিবেশ করে দীর্ঘ ভূমিকা আর প্রলম্বিত করব না। শতবর্ষ পরের নতুন

সংস্করণে প্রয়োজনীয় টীকা ভাষ্য যুক্ত করে গ্রন্থের পাঠকপ্রিয়তার প্রচেষ্টা রয়েছে। দীর্ঘ ভূমিকার মাধ্যমে বিপ্লববাদের একটা গাথা রচনার চেষ্টা রয়েছে। মুল বইতে ছিল না কিন্তু গুরুত্ব বিবেচনায় কিছু তথ্য পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বিপ্লবীরা যে কেবল ইংরেজ শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে সশস্ত্র কাজ করত তা নয়, গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে প্রান্তিকের মানুষের সামনে বিপ্লবীকাজের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে জাগরণ ও নিজস্ব জবাবদিহিতা ছিল। ইংরেজ শাসনের ভেদনীতির অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা ছাড়াও জনগণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে সাংগঠনিক তৎপরতা ছিল। বিপ্লবীরা সাংগঠনিক কাজে বিবিধ স্লোগান ব্যবহার করত। যেমন—

বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত
মায়ের দুর্দশা ঘুচাবে ভাই।

গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যায়ের ভাগ বিভাজনের মাধ্যমে তৎসময়ে বিপ্লবী কাজের অবিভক্ত বাংলার চিত্রপট উঠে এসেছে। অধ্যায় শিরোনামে আছে—দেশাত্মবোধ, স্বদেশী আন্দোলন, নানাভাবের লোকসমাগম, বিপ্লবের অঙ্ক, গুপ্তধারা, সমিতির দুর্দিন, মামলা, জেলের অধ্যায়, মামলার ফল, মতভেদ, সমাজ ও সাহিত্যে বিশেষত্ব, ঘরছাড়া গোপন ও অখ্যাত জীবন, খুন, আগুনের খেলা, বৈদেশিক অংশ, বিপ্লবের শেষ শিখা ইত্যাদি। গ্রন্থের শেষাংশে পরিশিষ্ট ও বাংলার বিপ্লবীদের বয়স, জাতি ও পেশার বিভাজনে একটি তালিকা সিডিসন কমিটি হতে সংগ্রহ করে এখানে যুক্ত হয়েছে।

সার্বিকভাবে বিপ্লববাদে বাংলা অঞ্চলের একটি সামাজিক চিত্র তুলে ধরার বিষয় আছে বইটির বিন্যাসে। পরিশেষে শতবর্ষ পূর্বে বিপ্লববাদের মাধ্যমে সমাজ মেরামতের যে তাগিদ ছিল বর্তমান কালপর্বেও সমাজের নানান অসংগতি দূরে বিপ্লববাদের বইয়ের নব উপস্থাপনা শিক্ষা ও দ্যুতি সমাজের জন্য ভিন্ন আঙ্গিকে সুপ্রভাব ফেলবে—এ আশা করতেই পারি। নবসংস্করণে যুক্ত প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অমিয়ধারা প্রবাহমান। এই প্রবাহকর্মে পাঠক গ্রন্থ পাঠান্তে মতামত দিলে পরবর্তী বই মেরামতের কাজে তা যুক্ত করার আশা রাখি। সকলের জন্য শুভাশিস।

১৮ অক্টোবর ২০২৫
ধানমন্ডি, ঢাকা।

খান মাহবুব
প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

'বাঙ্গলায় বিপ্লববাদ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। 'শঙ্খে' ইহার কতকটা বাহির হইয়াছিল, সবখানি হয় নাই। বিপ্লবযুগের ঠিক ইতিহাস আমি লিখি নাই। লেখা সম্ভবও নহে। বিপ্লববাদের অনেক খবরই নানাভাবে প্রচারিত হইয়াছে। সংবাদপত্র ও পুলিশের রিপোর্ট, প্রচলিত জনরব, কোন কোন রাজনৈতিক মামলার বিবরণী, বিপ্লবযুগের স্বীয় ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং রৌলট কমিটির রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া বিবৃত ঘটনাগুলি সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। কোথাও ভুল থাকিতে পারে—তবে তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না, কেননা আমি যাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা ইতিহাস নহে, বিপ্লববাদের অন্তর্নিহিত কতগুলি ভাব। অনেকেই বিপ্লবযুগকে সরাসরি ভাবে বিচার করিয়া, সেটা ভাল কি মন্দ, ইহা এক নিঃশ্বাসেই বলিয়া ফেলে, কিন্তু বিষয়টা সত্যই অত অনায়াসে ধরা যায় না। প্রকাশটাই সংসারে সবখানি কথা নহে—প্রকাশের অন্তরালেও সময়ে অনেক সত্য আত্মগোপন করিয়া থাকে—সে কথা না জানিলে, যাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহারও সত্যকার রূপকে ধরা যায় না। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই বিপ্লববাদের তথা বিপ্লবযুগের কতগুলি দিক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বিপ্লবযুগকে ভাল বা মন্দ বলিবার কোন উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ লিখিত নহে। গ্রন্থ লিখিবার উদ্দেশ্য, ভুল ভ্রান্তি, দোষ গুণসহ দেশবাসীর কাছে বিপ্লবযুগকে পরিচিত করা। যাহারা সেই যুগকে নিছক প্রশংসা করেন, আর যাহারা সে যুগকে নিছক নিন্দার্হ মনে করেন, তাহারা সেই যুগের সত্যকার পরিচয় পাইলে, প্রশংসা করিতে ও নিন্দা করিতে হয়ত আর একটু বিবেচনা করিবেন।

বাংলার বাহিরের বিশেষ কোন কথা আমি লিখি নাই। বাংলার বিপ্লববাদীদের কথাই আমি প্রধানত বলিয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে কোন বিপ্লববাদীর জীবনকথা বলি নাই। সমগ্র ব্যাপারটাকে ফুটাইয়া তুলিতে স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত দুই চারিটা কথা বলিয়াছি মাত্র।

বিপ্লববাদীদের জেলভোগের কোন পরিচয় দেই নাই। তবে জেলভোগটা বিপ্লববাদীরা কে কেমনভাবে গ্রহণ করিত তাহার পরিচয় দিতে, ঢাকা জেলের সামান্য পরিচয় দিয়াছি।

পলাতক নলিনী বাগচীর কথা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাকড়াশী লিখিত বিবরণী হইতে গ্রহণ করিয়াছি। সিডিশন কমিটির রিপোর্ট হইতেও অনেক সাহায্য

পাইয়াছি। পরিশিষ্টে লিখিত, অভিযোগের কথা *Modern Review, Amrita bazar Patrika* ও *Englishman*-এ প্রকাশিত তদন্ত কমিটির মন্তব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাদের সকলের নিকটই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পুস্তক মুদ্রাঙ্কনে অমার্জনীয় ভুল রহিয়া গিয়াছে। সময়ের অভাব ও ছাপাখানার ত্রুটি, যে ভুলের বোঝা বাড়াইয়াছে তাহা শুধু ক্ষমা চাহিয়া হাল্কা করিতে চাহি না। শুদ্ধিপত্রে উকার, ইকার, য, ষ, প্রভৃতি ভুল শোধরাই নাই—কেবল মারাত্মক কয়টা ভুলের শুদ্ধিপত্র দিলাম। পুঁথি বাড়িবে বলিয়া তর্জমা না করিয়াই স্থানে স্থানে সিডিশন কমিটির ইংরেজী রিপোর্ট উঠাইয়া দিয়াছি। ইহাও আর এক ত্রুটি। বর্তমানে প্রতিকারের উপায় নাই, এতগুলি ত্রুটি লইয়াই পুস্তক প্রকাশিত হইল।

৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ বঙ্গাব্দ

শ্রী নলিনী কিশোর গুহ
৪০ মীর্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা